গত কয়েক দিনের মধ্যে গত রাতেই বোধহয় ঠাণ্ডাটা কট্টর ছিল। আজ বিছানা ছেড়ে বেরিয়ে আসতে একটুও ইচ্ছে হচ্ছিল না। জানালার কাঁচ খোলা, বাইরের পৃথিবীটা আড়ালে। কিন্তু যেহেতু ঘড়ি বলছে এখন সকাল দশটা তাই অস্বস্তি শুরু হল। ঠিক এই মুহূর্তে যদি ঘড়িতে সময় সাড়ে ছয় বা সাত থাকত তাহলে দিব্যি ঘুমিয়ে পড়তে পারতাম। যেই জানলাম বেলা বেশ হয়ে গেছে অমনি শরীরের অন্য প্রয়োজনগুলো প্রকট হল, টয়লেটে ছুটতেই হবে যখন তখন বিছানা না ছেড়ে উপায় কি।

মিনিট পনের বাদে ধোঁয়া ওঠা এককাপ গরম চা নিয়ে দরজা খুলে আবার কাঠের বারান্দায় এসে দাঁড়ালাম। পাহাড় তো বটেই সামনের রাস্তাটাও কুয়াশায় ঢেকে গেছে। কাঠের বারান্দায় কুয়াশারা দাগ রেখে গেছে। ওখানে পড়ে থাকা বেতের চেয়ার এখন বেশ স্যাঁতসেঁতে। সেটায় বসে যে মগে আরাম করে চুমুক দেব তার উপায় নেই।

এখন আমার শরীরে যাবতীয় শীতবস্ত্র। এই এলাকাটা একেই বেশ নির্জন, তার ওপর শীত এবং কুয়াশা বাড়লে অথবা বৃষ্টি পড়লে মনে হয় পৃথিবী থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে আছি। অনেক তল্লাসির পর এরকম জায়গা খুঁজে পেয়েছি আমি।

চারপাশে তাকালাম। তাকাতেই মনে হয় এই মেঘ, কুয়াশা, ছায়ায় সময় যেন বেড়ে ওঠার আগেই ফুরিয়ে যায়। হঠাৎ আলো নিভল অন্ধকার জানান দিল আর বোঝা গেল এখন রাত। তার আগে কখন যে দুপুর-বিকেল গেলে গেলো তা টেরই পাওয়া যায় না।

খুব কাছের বাড়িটা মিনিট আটেক দূরে। এই রাস্তাটা যেখানে বাঁক নিয়েছে সেখানে। একজন প্রাক্তন নাবিক থাকেন সেখানে। ভদ্রলোক অবসর নিয়েছেন বছর দুয়েক হল। তার ছয়মাস আগে বিয়ে করেছিলেন একজন গোয়ানিজ মহিলাকে। এটি ওর তৃতীয় বিয়ে। এই বিয়ের পর তার প্রথম দু'পক্ষের সন্তানরা সম্পর্ক ত্যাগ করেছে। ওই গোয়ানিজ মহিলাও এতদিন স্বামীর কাছে আসেননি। শেষ পর্যন্ত পদার্পণ করেছেন মাস দুয়েক হল। প্রায় তিরিশ বছর পরে জন্মানো স্ত্রী বাড়িতে আসার পর নাবিক ভদ্রলোককে খুব কমই বাড়ির বাইরে দেখা যায়। ভদ্র মহিলার কাছে আমি কৃতজ্ঞ। নইলে রোজ দু'বেলায় সমুদ্রের গর্জন শুনতে হত পাহাড়ে বসে।

আমার এই বাড়ি থেকে বাজার পাক্কা এক মাইলের পাহাড়ি পথ। ওখানটা বেশ জমজমাট। বাস টার্মিনাল, সিনেমা হল, দোকানপাট বাজারগুলো যেমন হয় আর কি। সপ্তাহে একদিন যেতে হয় আমাকে। সাতদিনের খাবার, প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র, সিগারেট, ওষুধ কিনে এক মাইল পাহাড়ি পথ ভাঙ্গতে ইচ্ছে হয় না বলেই ট্যাক্সি নিই। এক মাইলের জন্যে তিরিশ টাকা চাইলে ট্যাক্সিওয়ার সঙ্গে ঝগড়া করার কোন মানে হয়না। এরকম নির্জনে জোরে কথা বলাও ঠিক নয়।

এই বেশ আছি। চা শেষ করলাম আমি। বারান্দায় আর এক কোণে গিয়ে দাঁড়ালাম। এখন থেকে সূর্য ঠিকঠাক আলো ফেললে, বরফের চূড়াগুলো স্পস্ট দেখা যায়। কিন্তু আজ তার সুযোগ নেই।
বাজারের হোটেলে থেকে বাড়ির খোঁজ করতেই একজন সন্ধান দিয়েছিল। যার বাড়ি তিনি থাকেন সমতলের শহরে। বছরে দিন সাতেকের জন্যে এখানে আসেন ছুটি কাটাতে। শর্ত হল, তিনি যখন আসবেন তখন তাকে বাড়িটা ছেড়ে দিতে হবে। দিন সাতেকের জন্যে এই শর্ত মেনে নিয়েছি। ইতিমধ্যে একটি বছর কেটেছে আর ভদ্রলোক সস্ত্রীক ঠিক সাতটা দিন এখানে থেকেছিলেন। ওই সময় আমি চলে গিয়েছিলাম পাহাড়ের ওপরের ফরেস্ট বাংলোয়। পরিবর্তনটা মন্দ লাগেনি। ফিরে এসে দেখলাম আমার যাবতীয় জিনিস ঠিকঠাক রয়েছে, ওরা সেগুলো স্পর্শ পর্যন্ত করেননি। উল্টো বাড়িটাকে আরও একটু পরিছন্ন করে গেছেন।
অথচ টিঙ্কু যখন পাশে ছিল তখন এরকম জীবনের কথা ভাবতেই পারতাম না। সকালে ঘুম ভঙ্গার পর যে হৈচৈ শুরু হত তার শেষ মাঝ রাতে, ঘুম এলে। অবশ্য সন্ধ্যেটা ছিল ওর, আমার নয়।
ওসব কথা আজকাল মনে করতে চাইনা। কিন্তু এই না চাওয়ার সঙ্গে মনের কিছুতেই বনিবনা হয়না। যেমন এখন, চারপাশে কুয়াশার দেওয়াল আর হাতে শূন্য চায়ের মগ নিয়ে টিঙ্কুর মুখ ভেসে উঠল। টিঙ্কু গাইত প্রচুর হিন্দী আর কিছু হিট বাংলা গান। শুধু একটা রবীন্দ্রনাথের গান ওর মুখে শুনতে পেতাম। তাও যখন অন্ধকার করে মেঘ ঘনিয়ে বিকেল হওয়ার আগেই সন্ধ্যে নামতো তখনই। টিঙ্কু গাইতো, 'মেঘের পরে মেঘ জমেছে-।' কুয়াশারা মেঘ নয়, তবুও এখন ওদের মেঘ বলে ভাবতে ইচ্ছে করছে।
ঘরে ফিরে গিয়ে বেসিনে মগ রাখলাম। এখন কল খুলে ওটাকে ধোওয়ার চেষ্টা না করাই ভাল। দুপুরে নিশ্চই ঠাণ্ডাটা কমবে।
গত সপ্তাহে বাজারে মাছ আসেনি। এখানে খাসির মাংস পাওয়া যায় মাঝে মাঝে, চিকেন প্রচুর আর বিফ বেশ সস্তা। চিকেন বা বিফের থেকে পাঁঠা বা খাসির মাংসের ওপর আমার একটু টান আছে। সেদিন শুনেছিলাম আজ খাবার দোকানে খাসি কাটা হবে। একবার ঘুরে আসা যাক। রাস্তায় বেরিয়ে পড়লে অন্যরকমের আরাম হয়।
জিনস, জ্যাকেট, মাফলার, জর্থাস্টার আর মাথায় পাগড়ি টুপি, কাঁধে লম্বা স্ট্রাইপের ব্যাগ, হাঁটতে হাঁটতে হেসে ফেললাম। এখন তাকে মাছ বা খাসির মাংস নিয়ে মাথা ঘামাতে হচ্ছে। টিঙ্কু শুনলে হেসে গড়িয়ে পড়ত। যে লোকটাকে কাজে লাগাতে তাবড় তাবড় রুই কাতলারা দিনরাত পেছনে লেগে থাকত, মৃত্যুকে উপেক্ষা করে বুদ্ধিকে কাজে লাগিয়ে যে প্রবলভাবে বেঁচে থাকত, সেই মানুষ কি করে কষা মাংস রাঁধবে তা নিয়ে ভেবে কুল পায় না, তখন তো হাসি পাবেই। কিন্তু সত্যি বলতে কি এসব নিয়ে থাকতে আবার মন্দ লাগছে না। এর ভেতরেও একটা অন্যরকমের আনন্দ আছে যা আমি আগে জানতাম না।
মোড় ঘুরতেই বাড়িটার দিকে তাকাতে প্রাক্তন নাবিককে দেখতে পেলাম। এই ঠাণ্ডায় একটা লম্বা ঝাঁটা দিয়ে বারান্দা পরিষ্কার করছে। লেখালেখি হতেই বলল। হা-ই।'
আমি দাঁড়ালাম, আপনার কি হয়েছে ?'
নাবিক বলল 'কেন? আই অ্যাম ফাইন।'
'তাহলে অনেকদিন আপনার দেখা পাইনি কেন?' চিৎকার করে বলতে হল'
'আমার স্ত্রী এসেছেন, বুঝতেই পারছেন, সময় দিতে হচ্ছে! এসব বুঝবেন না।'
এইসময় একজন মহিলা বেরিয়ে এলেন,' কেন? বুঝবেন না কেন? নির্বোধ নাকি?'
মহিলার শরীরে ওভার কোট মুখচোখ ভালোই ফর্সা।
নাবিক নিচু গলায় কিছু বললেন। সম্ভবত আবার একা থাকার কথাই জানালেন। ভদ্রমহিলা কাঁধ নাচালেন এবং আমাকে শুনিয়ে বললেন, 'এরকম স্থুল রসিকতা আমি একদম পছন্দ করি না।'
'ঠিক আছে, ঠিক আছে, আর বলব না।' চটপট মেনে নিলেন নাবিক। আমার বেশ মজা লাগছিল। আচ্ছা, একেই কি স্ট্রেন বলে? ওকে আর বিরক্ত না করার জন্যে বললাম, 'আচ্ছা, চলি। পরে দেখা হবে।'
'হ্যাঁ। কিন্তু কবে দেখা হবে তা আপনাকে বলতে পারছি না।'
'কেন?' অবাক হলাম।
'অসুবিধে আছে।'
মনে হচ্ছে আপনার মধ্যে একটা পরিবর্তন হয়েছে। ঠিক আগের মত কথা বলতে পারছেন না।' আমি হাত

নাড়ালাম।
হঠাৎ ভদ্রমহিলা গলা তুললেন, 'এক্সকিউজ মি, দয়া করে একটু কাছাকাছি আসবেন ? বেশ মজা লাগছিল। বাড়ির সামনে পৌঁছালে মহিলা বললেন, 'আপনি যখন আমাদের প্রতিবেশী তখন নিশ্চয়ই আমার পরিচয় জানেন! যদি না জানেন তাহলে জানিয়ে দিচ্ছি, এই ভদ্রলোক আমার স্বামী।'
'আপনার সঙ্গে আলাপ করে খুশী হলাম।'
'ধন্যবাদ। আপনি বললেন এই ভদ্রলোক ঠিক আগের মত কথা বলছেন না। তার মানে হল, আমি এখানে আসার পর ওর কথা বলার ধরন বদলে গেছে। রাইট ?'
'হ্যাঁ। আপনি এখানে আসার আগে উনি দু'বেলা আমার ওখানে যেতেন– গল্প।
বাধা দিলেন মহিলা,। বিশ্বাস করছি না। উনি গল্প করতে জানেন না। তার থেকে বলুন,উনি একাই কথা বলে যেতেন, আপনার কথা শুনতে চাইতেন না। কারেক্ট ? আমি এসে কিছু ডিসিপ্লিন এনেছি। উনি দিনের মধ্যে এক ঘণ্টা যা ইচ্ছে বলে যেতে পারেন কিন্তু বাকি তেইশ ঘণ্টা মুখ বন্ধ রাখতে হবে। আজ যে কথাগুলো বলেছেন তা ওই সময়ের মধ্যে। অর্থাৎ আর পঞ্চাশ মিনিট পরে উনি মুখ বন্ধ করে রাখতে বাধ্য।
মাথা নাড়লাম, অভিনব ব্যাপার। এবার আমি বলি। দেরি হয়ে গেলে বাজারে কিছুই পাব না।
'আই সি'। আপনি বাজারে যাচ্ছেন! আমাকে দু'মিনিট সময় দেবেন ?'
'বুঝতে পারলাম না।'
'আপনাকে তো গবেট বলে মনে হয়না।' শরীর বেকিয়ে মহিলা ভেতরে চলে গেলেন। প্রাক্তন নাবিক খুকখুক করে হাসল। তাকে জিজ্ঞাসা করলাম' উনি আমার সঙ্গে যাবেন? কাঁধ ঝাঁকিয়ে সে জানালো কিস্যু জানেনা।
বললাম, 'আপনার তো এখন কথা বলার সময়, বলছেন না কেন?'
মহিলা বেড়িয়ে এলেন, 'অত্যন্ত হিসেবী। দশ মিনিট বলেছে, বাকি পঞ্চাশ মিনিট হাতে রেখে দিচ্ছে। চলুন।'
পরনে জিন্স, পুলওভার , মাথায় রুমাল বাঁধা, হাতে ব্যাগ নিয়ে ঘুরে দাঁড়ালেন, যেখানে যা যা করতে বলেছি করে রাখবে। কোন অজুহাত শুনতে চাইনা।'
প্রাক্তন নাবিক ঘাড় নাড়লেন।
মিনিট দুয়েক চুপচাপ হাঁটলাম আমরা। চারপাশে কুয়াশা পাক খাচ্ছে।
কিছু বলতে হয় তাই জিজ্ঞাসা করলাম, কুয়াশা আপনার কেমন লাগে?'
' নো। নট এ্যাট অল। আপনার ?'
'আমার বেশ রহস্যময় মনে হয়।'
'থ্রিলার-ট্রিলার পড়ার অভ্যেস আছে?'
'না। ওটা এমনি এমনি মনে আসে।'
'ব্যক্তিগত কথা বলা আমি পছন্দ করিনা। এখন যেহেতু একসঙ্গে হাঁটছি তখন আপনার শখ আমার জানা দরকার। আমি জুলি।'
নাম বললাম, 'শান্ত।'
ওয়েল শান্ত, আমি শুনেছিলাম আপনি এখানে একা থাকেন।'
'ঠিকই শুনেছেন।'
স্ত্রী কোথায়?
'আসেননি। আমার জীবনে কেউ স্ত্রী হয়ে আসেননি।'
' কেন ? আপনার কি কোন গোলমাল আছে?'
'যাচাই করার সুযোগ হয়নি ম্যাডাম।
ও, ঃ ম্যাডাম বলার কি দরকার ? জুলি বলবেন, বুঝলেন?'
'ঠিক আছে, মনে থাকবে।'
'তাহলে আপনি একা থাকেন। নিজেই নিজের সংসার চালান। কিন্তু আপনার বয়স তো চল্লিশের নিচে। এই বয়সেই কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে একলা থাকছেন, এর মধ্যেই প্রচুর টাকা রোজগার করেছেন, তাই না? জুলি জিজ্ঞাসা করলেন।

‘তেমন কিছু নয়। তবে যা পেয়েছি তার জন্যে পরিশ্রম করতে হয়েছে। বললাম।
‘সেই টাকা যখন শেষ হয় যাবে।’
‘তখন আবার পরিশ্রম করতে বেরুবো।’
‘হুস্।’ খানিকটা হাঁটার পর জুলি জিজ্ঞাসা করলেন, ‘একা থাকতে আপনার ভালা লাগে?’
‘মন্দ লাগে না, শুধু এটুকু বলতে পারি।’
‘আপনি নিশ্চয়ই শুনেছেন আমি নিশ্চয় তার থার্ড ওয়াইফ?’
মুখে কিছু না বলে মাথা নেড়ে হ্যাঁ বললাম।
‘এ ব্যাপারে উনি আপনার থেকে তিনগুণ সক্রিয় পুরুষ। আপনি নিশ্চয়ই প্রশ্ন করবেন আমার থেকে এত বেশী বড় একটা লোককে কেন বিয়ে করলাম। জুলি তাকালো।
‘কারও ব্যক্তিগত ব্যাপারে একথা বলা আমি পছন্দ করি না।’
‘রাইট! মাথা দোলালেন জুলি।’
এখন এই রাস্তার দু’ধারে যেসব বাড়ি তার সবগুলো কাঠের। রাস্তার ওপর এখনও ফিনিফিনে কুয়াশা। সামনেই বনবিভাগের দপ্তর, পূর্তদপ্তরের কার্যালয়। এর পরেই ডান দিক ঘুরলেই বাজার। বললাম, ‘আমরা বাজারে পৌঁছে গিয়েছি।’
‘আপনি কি কিনবেন? খুব দেরি হবে?’ জুলি দাঁড়ালেন।
‘মাংস।’ খুব নির্লিপ্ত গলায় বললাম।
‘অ। আমি ভেজিটেরিয়ান। এতটা পথ একা ফিরে যাওয়া বিরক্তিকর। আমরা কি ফেরার সময়টা ঠিক করে নিতে পারি?’
ঘড়ি দেখে বললাম,’ ঠিক আধঘন্টা বাজে এখানে দেখা হতে পারে?
‘ওটা পঁয়তাল্লিশ মিনিট করুন।’
‘ঠিক আছে।’
ভদ্র মহিলাকে সবজির বাজারের মুখে ছেড়ে দিয়ে মাংসের দোকানের সামনে পৌঁছে দেখলাম ওটা বন্ধ। ওপাশে কয়েকজন দিশি মুরগী নিয়ে বসে আছে কিন্তু তাদের চেহারা দেখে ইচ্ছে হল না নেওয়ার। ভিড় হয়েছে যে মাছ ওয়ালার সামনে সে একটা বিশাল বোয়াল কেটেছে। দেখলেই বোঝা যায় মাছটা তাজা। মাছওয়ালা অন্যদিনের থেকে বেশী দাম চাইছে বলে খদ্দেরদের সাথে ঝগড়া হচ্ছে।
ভিড় ঠেলে সামনে গিয়ে বললাম,‘দু’কিলো।’
মাছওয়ালা বলল, দাম কম হবে না কিন্তু।
হাসলাম, ভাল জিনিসের দাম সব সময় বেশী হয়।
‘বলুন বলুন। আপনি যে হক কথাটা বললেন তা কেন এরা বুঝতে পারে না? চটপট দু’কেজি মাছ কেটে টুকরো করে পলিথিনের প্যাকেটে ভরে দিল মাছওয়ালা। দাম মিটিয়ে মসলার দোকান থেকে কিছু মসলা কিনে নিলাম। দু’কেজি সলিড বোয়াল মাছ মাংসের চেয়ে কোন অংশে খারাপ নয়। ছেলেবেলায় বাড়িতে বোয়াল মাছ ঢুকতো না। কেউ খেতো না। এখন ব্যাপারটাকে নেহায়াতই বোকামি বলে মনে হয়। এই শহরের একমাত্র বিলিতি মদের দোকানের সামনে চলে এসেছি। একটা বড় বোতল রাম কিনলাম। এখানে আমার পর হুইস্কি থেকে রামে এসে দেখলাম বেশ ভাল লাগছে। নিচে নেমে চায়ের দোকানে ঢুকে ডাবল ডিমের পোচ আর টোস্টের অর্ডার দিয়ে বেঞ্চিতে বসলাম। দোকানে ভিড় নেই। নিচের রাস্তাটা পরিষ্কায় দেখা যাচ্ছে। কুয়াশারা এখন পাহাড়ের মাথায় চলে গেছে। হালকা রোদ উঠেছে।
মহিলার নাম জুলি। প্রথম দর্শনে বুঝতে পারেনি কিন্তু রাস্তায় নামার পর বোঝা যাচ্ছিল ওর ফিগার অসম্ভব রকমের ভাল। কোন কোন মহিলাকে ঈশ্বর তেমন মুখ-চোখ না দিয়ে শরীরটাকে নিখুঁত করে দেন। ইনি তাদের একজন। ডাবল বয়সের প্রাক্তন নাবিককে মহিলা বোঁকার মত করে রেখেছেন। আচ্ছ এই নাবিক ভদ্রলোকের প্রথম স্ত্রীর গল্প যা শুনেছি তাতে বোঝা যায় ওর মেজাজ খুব শান্ত ছিল। সমুদ্র থেকে ছুটি পেয়ে যখন বাড়ির ফিরত তখন খুব সেবা-যত্ন করত। দ্বিতীয় পক্ষের বউটা নাকি একটু বোকাসোকা ছিল। অর্থাৎ ব্যক্তিত্ব ছিল না। ভাবতেই হাসি পেল আমার। অজান্তেই শব্দ করে হাসলাম।

‘আপনাকে এই প্রথম হাসতে দেখলাম।’
অবাক হয়ে মুখ ফিরিয়ে ওপাশের টেবিলের দিকে তাকাতেই ভুলটা বুঝতে পারলাম। কথাটা তার উদ্দেশ্যে নয়, ওখানে যারা বসে আছে তাদের একজন আর একজনকে বলছে। সঙ্গে সঙ্গে টিঙ্কুর মুখ মনে এল, ‘সারাক্ষন এত গম্ভীর থাকা কেন? হাসতে পার না?’
‘কি করব বল? আমার মুখটাই এইরকম।’ বলেছিলাম।
‘তোমার সঙ্গে কথা বলে পারি না।’ টিঙ্কু সরে গিয়েছিল।
ওটা ওর স্বভাব ছিল। তোমার সঙ্গে হেঁটে তাল রাখতে পারি না, তোমার সঙ্গে ঝগড়া করে পারি না। অথচ অত না পেরেও এখন কেমন করে আমাকে অধিকার করে রয়ে গেছে।
খাবার এল। মন দিয়ে ব্রেকফাস্ট করলাম। এই সময় রেস্টুরেন্টের মালিক এসে সামনে বসল. ‘গুড মর্নিং স্যার।’
‘গুড মর্নিং।’
‘আপনাকে অনেক দিন ধরে দেখছি, মাঝেমাঝেই দোকানে আসেন কিন্তু গম্ভীর হয়ে থাকেন বলে বিরক্ত করিনি। আপনার নাম জানতে পারি?’
‘শান্ত।’
‘তাহলে ভুল হয়েছে।’
‘মানে?’
‘কাল বিকেলে দু’জন লোক একজনের খোঁজ করছিল। তার চেহারা বর্ণনা আপনার সঙ্গে মেলে।’
–‘আচ্ছা!’
‘ওরা কার?’
‘কখনও দেখিনি। মনে হয় এখানে প্রথম এসেছে। একটা নাম আর চেহারার বর্ণনা দিন। বলল লোকটা এখানেই থাকে।’ আমি আন্দাজের ওপর কথা বলি না। তাছাড়া।’ দোকানদার কথা শেষ করবে কিনা ভাবল।
একটু অপেক্ষা করে বললাম, ‘বলুন।’
‘মানে, লোক দুটোর চেহারা, কথা বলার ধরন ভাল নয়।’
‘তাই?’ পার্স খুলে বেয়ারাকে ইশারায় ডাকলাম।
‘আমি বাজি রেখে বলতে পারি ওদের একজনের কোমরে রিভলভার গোঁজা ছিল।’
কত হয়েছে জেনে নিয়ে দাম মিটিয়ে দিয়ে দোকানদারকে বললাম, ‘ খরবটা দেওয়ার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ।’
‘এখান আপনি কোথায় বাড়ি নিয়েছেন স্যার?’
‘মাইলখানেক দূরে। বলি। দেখা হবে।’ মানপত্র নিয়ে বেরিয়ে এলাম।
জুলির জন্য অপেক্ষা করছিলাম নির্দিষ্ট জায়গায়। কিন্তু দুশ্চিন্তাকে এড়াতে পারলাম না। এখানে কারা আবার আমার খোঁজে এসেছে যাদের কোমরে রিভলভার গোঁজা আছে? লোকগুলোর চেহারা, কথা বলার ধরন দোকানদারের ভাল লাগেনি। কোন ডিটেকটিভ এজেন্সির লোকজন সাধারণত এ রকম ধারণা মানুষের মনে তৈরী করবে না। তাহলে কি এরা স্রেফ ভাড়াটে গুন্ডা? কে পাঠাল ওদের আমার খুঁজে বের করতে?
বেশ ছিলাম, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে কেউ যেন ঘারের পেছনে নিঃশ্বাস ফেলছে। তাহলে কি আমাকে গোপনে এখান থেকে চলে যেতে হবে? আচ্ছা লোক দুটো নিশ্চিত হয়ে কি করে বলল, আমি এখানেই থাকি? কে খবর দিল ওদের?
আবার এমন হতে পারে ওরা অন্য কারো খোঁজ নিতে এসেছে। চোহরায় মিলে যাওয়ায় দোকানদার ভুল করেছে। ওরা তো শান্ত নামটা ব্যবহার করেনি। যারা আমাকে খুঁজতে আসবে তারা নাম জিজ্ঞাসা করবে না? অবশ্য আসল নামটাকে আমি একটু ছোট করে নিয়েছি এখানে। তবে প্রসান্ত আর শান্তের মধ্যে তেমন কি ফরাক।
একটা গাড়ির আওয়াজ কারা এল এবং সেই সঙ্গে মহিলা কণ্ঠে, ‘উঠে পড়ল’ চিৎকার। তাকিয়ে দেখলাম এখানকার বাজারে, যে গুটি কয়েক ট্যাক্সি রয়েছে তার একটাকে নিয়ে এসেছেন জুলি। আমাকে অবাক হতে দেখে পাশে পৌঁছে বললেন, ‘আর হাঁটতে পারছি না। ওপর নিচ করতে করতে পা ব্যথা হয়ে গেছে। চলে আসুন।’
দরজা খুলে মালপত্র নিয়ে মহিলার পাশে বসতেই ট্যাক্সি ছাড়ল। এত আওয়াজ হয় যে হর্ন বাজানোর দরকার

পড়ে না।
'কি কি কিনলেন?'
'ওই যে বলেছিলাম। মাংস পেলাম না, মাংসের চেয়ে ভাল জিনিস পেয়ে গেলাম। বোয়াল মাছ। সেই সঙ্গে মশলা আর মদ।' বললাম আমি।
'আপনি রোজ মদ খান?'
'হ্যাঁ।'
'ভাল লাগে?'
'খারাপ লাগলে খেতাম না।'
'হুস। আমি এখানে আসার আগে ওই নাবিক ভদ্রলোক আপনার বাড়িতে যেতেন?'
'হ্যাঁ। তাঁর মনের সব কথা উগরে দিতে আমাকে প্রয়োজন হত।'
'মদ খেতো না?'
'না। কোন দ্বীপে কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিল যে মদ ছোঁবেন না। সাত বছর সময়টা এখনো শেষ হয়নি।'
'কার কাছে প্রতিজ্ঞা করেছিলেন জানেন। আমার বাবার কাছে। আমার দিকে ছোঁক ছোঁক করেছিল বলে বাবা শর্তটা দিয়েছিল। এমনিতেই এত বড়, তার ওপর মাতাল। কোন বাবা রাজী হয়? বাবা আমাকে বলেছিল সারা জীবন মদ খাওয়ার পর সাত বছর না খেলে শরীর ভেঙ্গে পড়তে বাধ্য। বার্ধক্য এসে যাবে চটপট। তখন আর আমাকে বিয়ের কথা ওর মাথায় থাকবে না। বুলুন। তা বাবা মারা গেল দু'বছরের মধ্যে। ওর প্রতিজ্ঞা কিন্তু ভাঙ্গল না। এই আত্মত্যাগ দেখে আমি মরলাম, বিয়েতে রাজী হয়ে গেলাম।'
'তারও পরে সাত বছরের প্রতিজ্ঞা কি দরকার?'
'বলেছিলাম। কিন্তু লোকটা এমন গোঁয়ার যে বলল প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গলে নাকি বাবার আত্মাকে অসম্মান করা হবে। মর তুই।' জুলি জানালার বাইরে তাকালেন।
ওদের বাড়ি এসে গেল। জুলি বললেন, 'আলাপ হল। এভাবেই যাতায়াতের পথ দেখা হলে কথা হবে। ঠিক আছে?'
মালপত্র নিয়ে নেমে পড়লাম। ড্রাইভারকে যে ভাড়া দেয়া হবে তাতে সে আমাকে বাড়ী অবধি পৌঁছে দিতে পারত। কিন্তু জুলি কিছু না বলায় আমি অপেক্ষা করলাম না। ততক্ষণে দরজা খুলে প্রাক্তন নাবিক বেরিয়ে এসেছেন তৃতীয় পক্ষের স্ত্রীকে সাহায্য করতে।

এই সময় ঠাণ্ডাটা সামান্য কম বলে চটপট কয়েক পিস মাছ রান্না করে ফেললাম। একা থাকার আগে আমি কখনও কিচেনে ঢুকিনি। ঢুকতে হবে যখন, তখন রান্না করার নিজস্ব পদ্ধতি নিজেই আবিষ্কার করে নিলাম। ভাত এখন করলে খাওয়ার সময় সেটা এমন ঠাণ্ডা হয়ে যাবে যে, গেলা যাবে না। কাজকর্ম শেষ করে রামের বোতল এবং গ্লাস নিয়ে জানালার পাশের টেবিলে গিয়ে বসলাম। এখান থেকে রাস্তার অনেকটাই দেখা যায়। কেউ এলে আমার চোখ এড়াতে পারবে না।
একটা বাদামের সঙ্গে এক চুমুক রাম অতি উপাদেয়। গলা দিয়ে চালান করে আমি চোখ বন্ধ করলাম। কে হতে পারে? ভাড়াটে গুণ্ডা নিশ্চয়ই নিজেরাই আসবে না, কেউ ওদের পাঠিয়েছে টাকা খরচ করে। এই কেউটা কে? আট বছর আগে আমি স্পেশাল ট্রেনিং নিয়ে একটা বড় ডিটেকটিভ এজেন্সীতে চাকরি পেয়েছিলাম। প্রথমদিকে ওরা আমাকে সেই সব নারী-পুরুষের পেছনে খবর জোগাড় করতে পাঠাত, যাদের একজন আমাদের কাছে এসে ডিভোর্সের জন্য পর্যাপ্ত তথ্য চাইত। খুব বিশ্রী কাজ। নারী যদি ক্লায়েন্ট হত তাহলে সারাদিন পুরুষটি কোথায় কোথায় যাচ্ছে, কার সঙ্গে মিশছে তা জানতে হত। আর পুরুষ হলে নারীটি কারও সঙ্গে প্রেম করছে কি না সেটা জেনে প্রমাণ জোগাড় করতে হত। কোন থ্রিল নেই এই কাজে। বছরখানেক বাদে আমার প্রমোশন হল। দুই বড় শিল্পপতি, যাদের সামনাসামনি সদ্ভাব থাকলেও অন্যের ছিদ্র অন্বেষণে তৎপর, তাদের কেউ ক্লায়েন্ট হয়ে আসায় আমার ওপর দায়িত্ব অর্পণ করলেন মালিক। সেই কাজে চমৎকার সাফল্য পাওয়ার পরই কাল হল। কলিকাতায় একজন বড় ব্যবসায়ী আমাদের কোম্পানীকে প্রস্তাব দিলেন আমি যেন তার দেহরক্ষী হিসেবে সিমলায় যাই। সেখানে তিনি একটা ব্যবসায়িক মিটিং করতে যাচ্ছেন। টাকার অংক ভাল বলে মালিক রাজি হয়ে গেলেন। সেই

প্রথম প্লেনে উঠলাম আমি। দিল্লী হয়ে চন্ডীগড়। সেখান থেকে গাড়ীতে কালকা হয়ে সিমলার পথে। সিমলায় বড় হোটেলে ওঠা হল। কোন কাজকর্ম নেই, বেশ আরামে দিন কাটছিল। ভদ্রলোকের কাছে মাঝে মাঝে দু'একজন লোক আসে। তখন আমাকে বাইরে থাকতে হয়। হঠাৎ ভদ্রলোক বললেন আমাকে আর তার দরকার নেই। তিনি ওখান থেকে বোম্বে চলে যাচ্ছেন। তবে আমি যেন একটা ছোট ব্যাগ তার কলকাতার অফিসে পৌঁছে দিই। ব্যাগটিতে জরুরী কাগজপত্র আছে, ওটা যেন কখনই কাছ ছাড়া না করি। উনি একদিন পরে আসবেন বলে আমি সিমলা থেকে রওনা হলাম। ঘন্টাখানেকের মধ্যেই আমার ড্রাইভার জানান, একটা গাড়ী নাকি আমাদের অনুসরণ করছে। তবে সে কিছুতেই ওদের কাছে আসতে দেবে না। চন্ডীগড় পর্যন্ত যে গতিতে গাড়ী ছুটল তাতে আমার দম বন্ধ হয়ে যাওয়ার উপক্রম হয়েছিল। এয়ারপোর্টে পৌঁছে শুনলাম রানওয়েতে কি গোলমান হওয়ায় সেদিনের সব ফ্লাইট ক্যানসেল করা হয়েছে। অতএব হোটেলে উঠতে হল এবং সেই রাতে আমার ঘরে হামলা হয়েছিল। দু'জন বন্দুক দেখিয়ে ঢুকে ব্যাগটা চেয়েছিল। আমি অস্বীকার করি। বলি নিজের ব্যাগ ছাড়া অন্য কোন ব্যাগ আমার কাছে নেই। ওদের একজন তল্লাশি চালায়। ব্যাগটাকে আমি রেখেছিলাম বাথরুমের গিজারের ওপর। সেটা ওদের মাথায় আসেনি। না পেয়ে ওরা তখনকার মতো চলে যায়। এবার সন্দেহ হওয়ায় আমি ব্যাগ খুলি। ব্রাউন সুগারের প্যাকটগুলো নজরে পড়ায় পাথর হয়ে যাই। ওই করম একজন মানী ধনী ব্যবসায়ী আমাকে মিথ্যে কথা বলে কলকতায় ব্রাউন সুগার পাঠাচ্ছেন কেন তা কিছুতেই বুঝতে পারছিলাম না।

আমি আর দেরি না করে হোটেল ছেড়ে ট্যাক্সি নিয়ে সোজা সিমলায় ফিরে গেলাম। হোটেলের রিসেপশন বলল, ভদ্রলোক ঘরে আছে। ওপরে উঠে বেল বাজালাম। কেউ খুলল না। শেষ পর্যন্ত দরজায় চাপ দিতে সেটা খুলে গেল। ঘরে ঢুকে আমি হতভম্ব। ভদ্রলোক পড়ে আছেন মেঝের ওপর উপুড় হয়ে। শরীরে প্রাণ নেই তা বুঝতে পারা যাচ্ছিল। মুহূর্তেই সিদ্ধান্ত নিয়েছিলাম। ব্যাগটা নিয়ে বেরিয়ে এসেছিলাম হোটেল থেকে। ট্যাক্সি নিয়ে যেতে যেতে একটা বিশাল ঝোরা যা আগেই চোখে পড়েছিল। তার পাশে গাড়ি থামিয়ে নেমে পড়েছিলাম ব্যাগ নিয়ে। ব্রাউন সুগারের প্যাকেটগুলো খুলে সমস্ত বিষ ঝোরার জলে ফেলে দিয়েছিলাম। প্রায় কোটি টাকার সম্পত্তি জলের সঙ্গে মিশে তীব্র বেগে নীচে চলে গিয়েছিল। তারপর শূন্য ব্যাগটাকে নিচের খাদে ছুঁড়ে দিয়ে গাড়িতে উঠে পড়েছিলাম।

চন্ডীগড়ের হোটেলে পৌঁছতে রাত দশটা বেজে গিয়েছিল। স্নান সেরে বিছানায় শুয়ে সমস্ত ব্যাপারটা ভাবতে গিয়ে আবিষ্কার করলাম একটা বড় ভুল করেছি। ব্যাগের মধ্যে ব্রাউন সুগার রয়েছে জানামাত্র আমার উচিত ছিল অফিসে ফোন করে কি করণীয় তা জানতে চাওয়া। মালিকের নির্দেশ মত কাজ করা। বেটার নেট দ্যান নেভার। আমি উঠলাম। হোটেল থেকে ফোন না করে কোন এসটিডি বুথে যাওয়ার জন্য পা বাড়াতেই দরজায় শব্দ হল। খুলতেই দেখলাম চারজন পুলিশ দাঁড়িয়ে আছে। ওরা আমাকে এ্যারেস্ট করল। সিমলার হোটেলে কলকাতার বিখ্যাত ব্যবসনায়ীকে খুনের অপরাধে আমাকে থানায় নিয়ে গেল ওরা। তার আগে হোটেলের ঘর তন্নতন্ন করে খুঁজেও ওরা আপত্তি করার মত কিছু পেল না।

আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ, ওই ব্যবসায়ীর সঙ্গে আমি দেহরক্ষী হিসেবে সিমলায় গিয়েছি। সম্ভবত তার কোন গোপন ব্যাপার জানতে পেরে আমি ব্ল্যাকমেইল করি।

উনি টাকা দিতে রাজি হননি। উল্টো হোটেলকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যেহেতু ওর আর প্রয়োজন হচ্ছে না তাই আমাকে উনি কলকাতায় পাঠিয়ে দিচ্ছেন। অতএব, হোটেল যেন আমার বিলটা ওর কাছে পৌঁছে দেয়। আমি হোটেল ছেড়ে চলে গেলেও আবার ফিরে আসি। রিসেপশনে জানতে চাই উনি ঘরে আছেন কিনা। ওর ঘরে গিয়েই আবার নিচে নেমে আসি এবং কারও সঙ্গে কোন কথা না বলে বেরিয়ে যাই। পুলিশের ধারণা, ঐ সময়েই আমি ভদ্রলোককে খুন করেছি। পরদিন কোর্টে তোলা হলে বিচারক আমাকে জামিন দিলেন না, আরও তদন্তের জন্য পুলিশ হেফাজতে পাঠিয়ে দিলেন।

আমার কোম্পানীর লোক খবর পেয়ে দেখা করতে এসেছিল। পুলিশের সঙ্গে কথা বলার পর আমাকে লোকটি জানিয়ে গেল ফিরে গিয়ে মালিকের সঙ্গে কথা বলবে। লোকটি যখন আমার সঙ্গে কথা বলতে এসেছিল তখন একজন পুলিশ অফিসার পাশে থাকায় আমি ব্রাউন সুগারের ব্যাপারটার কথা না বলে যা ঘটেছিল সব বলেছিলাম। ততক্ষণে আমার মনে আত্মরক্ষার জন্য নানান যুক্তি তৈরি হয়ে ওঠায় আবার সিমলায় ফিরে গিয়ে ভদ্রলোকের সঙ্গে হোটেলে দেখা করতে যাওয়ার ঘটনা অস্বীকার করেছিলাম। কারণ আমি জানতাম এক্ষেত্রে একমাত্র সাক্ষী

রিসেপশনের সেই পৌঢ় লোকটি যাকে দেখতেই মনে হয় নেশা করে আছে। আমি বেশ জোরের সঙ্গে বললাম ওর দেখায় ভুল হয়েছে। দিল্লীর ফ্লাইট বাতিল হওয়ায় আমি এয়ারলাইসেন্সের ব্যবস্থাপনায় এই হোটেলে উঠেছি এবং চন্ডীগড়রের বাইরে যাইনি।
প্রায় তিন মাস পরে আমি জামিন পেলাম। আমার জামিনের ব্যবস্থা করেছিল টিঙ্কু। ওর বাবা চন্ডীগড়ের নামকরা উকিল। ওকালতি পাস করে ও বাবার জুনিয়ার। আমার কথা কাগজে পড়ার পর ও একদিন জেলে এসে আমার সঙ্গে দেখা করে জিজ্ঞাসা করেছিল উকিলের প্রয়োজন আছে কি না? ততদিনে আমার মন এমন বিষিয়ে গিয়েছিল যে বলেছিলাম আর আমার কাউকে দরকার নেই, সুযোগ পেলে আমি নিজেই বিচারককে সব বলব।
টিঙ্কু হেসে বলেছিল, ঠিক কথা, কিন্তু আপনি যা বলতে পারবেন না তা আমি বিচারকে বলব। জানেন তো, উকিলরা সত্যের সঙ্গে মিথ্যা বললে কোন দোষ হয় না। শেষ পর্যন্ত আমি রাজী হলাম। আমার জামিন পাওয়া গেল। গ্রেফতার হওয়ার সময় অল্প কিছু টাকা পকেটে ছিল। সেগুলো ফেরত পাওয়া গেল। আমার ওপর আদালতের আদেশ ছিল যেন চন্ডীগড়ের বাইরে না যাই। কলকাতার ব্যাংকে কয়েক হাজার টাকা আছে। ওদের চন্ডীগড়ের ব্রাঞ্চে সেটা ট্রান্সফার করিয়ে নিলাম। টিঙ্কু আমার জন্য সস্তায় একটা ভাল গেস্ট হাউসের ব্যবস্থা করে দিল।

জানালার পাশ থেকে উঠে এলাম। ইতিমধ্যে ছ-পেগ খাওয়া হয়ে গিয়েছে। এখন দুপুর দেড়টা। অথচ বাইরের আলো ভোরের মতো। টিঙ্কু বলেছিল মদ খেতে দেখলে আমার খারাপ লাগে না কিন্তু মাতাল দেখলে গা ঘিন ঘিন করে। এক সিটিং এ ছ-পেগের বেশি এখন খাই না।
ভাতটা গ্যাসে চাপিয়ে দিলাম। গত রাত্রের কিছু কাজ বাকি ছিল, সেগুলো শেষ করলাম চটপট। তারপর লাঞ্চ করলাম। একবার পেটে ভাত পড়লে অন্তত ঘন্টা চারেকের মধ্যে আর মদ খেতে ইচ্ছে করে না। উল্টো এখন শরীর আরাম চাইছে। হঠাৎই জায়গাটার কথা মনে পড়ল। আজ দুপুরে প্রতিদিনের মতো বিছানায় শুতে ঠিক স্বস্তি হচ্ছিল না। দোকানদারের কথা মনে আসতেই ঠিক করলাম ঝুঁকি নেওয়া অন্যায় হবে।
দরজায় তালা লাগিয়ে রাস্তায় নামলাম। বাজারের রাস্তার উল্টো দিক ধরে একটু হাঁটলেই পথ শেষ। কিন্তু ওপরে ওঠা যায়। পাথরে পাথরে পা ফেলে অনেকটা ওপরে ওঠার পর একটা আড়াল পার হতেই পাথরের চাতাল। বেশ বড়। ব্যাডমিন্টন কোর্টের মতো। এখন এখানে কুয়াশা নেই, আধমরা রোদ নেতিয়ে রয়েছে। নিচের দিকে তাকালেই আমার বাড়ি দেখা যাচ্ছে। একদম ছবির মতো।
চাতালে শুয়ে পড়লাম। পেটে মদ ছিল, তার ওপর ভাত পড়ায় ঘুম আসতে দেরি হল না। কিন্তু আমি জেগে থাকতে চাইলাম। মনে হচ্ছিল, দোকানদারের কথা যদি ঠিক হয় তাহলে যারা খোঁজ করছে তারা আজ সন্ধ্যের আগেই পৌঁছে যাবে। পাহাড়ের অচেনা জায়গায় কেউ রাত্রে যাওয়ার ঝুঁকি নেয় না। আমি উপুড় হয়ে বাড়ির দিকে তাকিয়ে থাকলাম।

টিঙ্কুকে আমি জিজ্ঞাসা করেছিলাম কেন সে আমার কেসটায় আগ্রহী হল। টিঙ্কু হেসে বলেছিল, খবরের কাগজে তোমার ছবি দেখে। মনে হয়েছিল এই লোকটা খুন করতে পারে না। তারপর সিরিয়াস হয়ে বলেছিল, 'যে কোন খুনী চাইবে না প্রমাণ রেখে খুন করতে। তুমি রিসেপশনে জিজ্ঞাসাবাদ করে ভদ্রলোকের ঘরে গিয়ে খুন করে আবার ওর সামনে দিয়ে বেরিয়ে যাবে, এটা হতেই পারে না।'
টিঙ্কু আদালতে প্রমাণ করেছিল যে আমি সিমলা থেকে চন্ডীগড়ে যখন যাই তখন একটা গাড়ি আমাদের ফলো করেছিল। সম্ভবত আততায়ী জানতে চাইছিল আমি সত্যি চন্ডীগড়ে যাচ্ছি কিনা! ইন্ডিয়ান এয়ারলাইন্সের অফিস বলছে আমি রিপোর্ট করেছিলাম এবং ওরা আমাকে এক রাত্রের জন্য হোটেলে দিয়েছিল। হোটেল বলেছে আমি চেক ইন করেছিলাম। তবে দুপুরের পর আমি কখন বেরিয়েছিলাম তা ওরা লক্ষ্য করেনি তবে ফিরেছিলাম রাত দশটার সময়। ফ্লাইট চালু থাকলে যার দিল্লী হয়ে কলকাতায় পৌঁছে যাওয়ার কথা তার নিশ্চয়ই সিমলার কাউকে খুন করার পরিকল্পনা থাকতে পারে না। দুটো সিনেমা হলের ম্যাটেনি এবং ইভিনিং শো-এর টিকিট কোর্টে দাখিল করে টিঙ্কু বলেছিল আমি সেদিন ওই চন্ডীগড়ে সিনেমা হলে বসেছিলাম। পুলিশের উকিল রিসেপশনিস্টকে হাজির

করেছিল আদালতে সাক্ষী হিসেবে। প্রৌঢ় ভদ্রলোক কথা বলছিলেন মাটির দিকে তাকিয়ে। তার মনে হচ্ছে তিনি আমার সাথেই কথা বলেছেন। টিঙ্কু কিছুক্ষণ কথা বলার পর বিচারককে অনুরোধ করল সাক্ষীকে প্রশ্ন করতে এই বলে যে, টিঙ্কুর চেহারা কি রকম! টিঙ্কু সাক্ষীর দিকে পেছন ফিরে দাঁড়াল। প্রৌঢ় ভদ্রলোক থতমত হয়ে গেলেন। তারপর বললেন, 'অল্প বয়স'।

বিচারক আদেশ দিলেন, 'চেহারার বর্ণনা করুন'। ভদ্রলোক সংকোচে বললেন, 'মহিলার মুখ বলে তিনি ভাল করে লক্ষ্য করেননি'। দর্শকরা হেসে উঠলে টিঙ্কু বলল, 'আর আমার কিছু বলার নেই। যে সাক্ষীর সঙ্গে এ মুহূর্তে কথা বলছি, তিনি যখন আমার মুখের দিকে তাকাননি তাঁর পক্ষে কয়েক মাস আগে ঘটে যাওয়া ঘটনার স্মৃতি মনে রেখে সাক্ষ্য দেয়া সম্ভব কিনা আদালত বিচার করবেন।' সরকারের উকিল তীব্র প্রতিবাদ করেছিলেন। শরীর-মুখের দিকে তাকান না যিনি, তিনি পুরুষের মুখ দেখবেন না– এমন ভাবা ঠিক নয়। কিন্তু সেটা বিচারকের মনে রেখাপাত করল না। প্রায় এক বছর পরে আমাকে মুক্তি দেয়া হল।

ততদিনে আমরা ঘনিষ্ঠ হয়ে গিয়েছি। টিঙ্কুর বাবার তীব্র আপত্তি সত্ত্বেও সে আমাকে বিয়ে করতে চাইল। কিন্তু আমার তখন-রোজগার নেই। টিঙ্কুর উদ্যোগে আমরা একটা ফার্ম খুললাম। আইন সংক্রান্ত যাবতীয় সাহায্য দেয়া হবে। টিঙ্কু আইনের দিকটা দেখবে আর আমি এ্যাডমিনিস্ট্রেশন। আমার কেইসটা জেতায় টিঙ্কুর খুব শখ হয়েছিল। ফলে প্রচুর ক্লায়েন্ট আসতে লাগল। সবাই যে কোর্টে যেতে চায়, তা নয়। ডিটেকটিভ এজেন্সীতে কাজ করার অভিজ্ঞতা থেকে আমি কোর্টের বাইরে অনেকের সমস্যার সমাধান করতে লাগলাম। দু'বছরের মধ্যেই ভাল রোজগার হল।

এই সময়ে আমরা রেজিস্ট্রি করলাম। যেদিন ছুটি থাকত, সেদিন মনে হত পুথিবীটা আমাদের। সন্ধ্যা হলেই ও আমাকে নিয়ে বেরিয়ে পড়ত। গাড়ী নিয়ে অন্ধকারে লং ড্রাইভে যাওয়া ছিল ওর নেশা।

মাস ছয়েক পরে টিঙ্কুকে সিমলায় যেতে হয়েছিল কাজে। বলেছিলাম, গাড়ী না নিয়ে ট্যাক্সিতে যেতে। গাড়ী চালাতে যে ভালবাসে তাকে এই প্রস্তাব দিলে কাজ হয় না। সে ভোরবেলায় বেরিয়ে গেল। বলল, সন্ধ্যার মধ্যেই ফিরে আসবে। সেই শেষ দেখা। পুলিশ খবর দিল, ওর গাড়ী এ্যাকসিডেন্ট করেছে। সম্ভবত ব্রেক ফেল করায় রাস্তা ছেড়ে খাদের গভীরে আছড়ে পড়েছে। অন্ধকারের জন্য আজ উদ্ধারের কাজ করা সম্ভব হয়নি। আগামীকাল সকালে সেটা হবে। পাগল হয়ে গেলাম যেন। তখনই দুর্ঘটনাস্থলে যেতে চাইলাম। মনে হচ্ছিল, খাদে পড়া সত্ত্বেও টিঙ্কু তো বেঁচে থাকতে পারে। কিন্তু পুলিশ আমাকে সকাল পর্যন্ত অপেক্ষা করতে বলল। ভোরবেলায় রওনা হলাম। স্থানীয় পুলিশ তখন উদ্ধার কাজ শুরু করেছে। ওপর থেকে দেখেই বুঝলাম, কোন আশা নেই। টিঙ্কুর গাড়ীটা টুকরা টুকরা হয়ে ছড়িয়ে গেছে। সারাদিন অনুসন্ধান পুলিশ চালিয়েছিল। রক্তমাখা জামা-কাপড় ছাড়া টিঙ্কুর আর কিছুই উদ্ধার করতে পারেনি। জলজ্যন্ত মেয়েটার শরীর উধাও হয়ে গিয়েছিল। পুলিশের ধারণা, শরীর টুকরা টুকরা হয়ে গিয়েছিল এবং সারারাত ধরে বন্যজন্তুরা সেগুলো ভোজন করেছে।

এই মৃত্যুর নিষ্ঠুরতা আমি সহ্য করতে পারিনি। চন্ডীগড়ে থাকতে পারিনি আর। সব কিছু বন্ধ করে এলোমেলো ঘুরেছিলাম নানান শহরে। শেষ পর্যন্ত এখানে এসে মনে হয়েছিল নিজের মত থাকতে পারব। না। আমি টিঙ্কুকে এখন স্বপ্নেও দেখি না। তবে ওর কথা, ওর হাসি, ওর তাকানোর ভঙ্গী মাঝে মাঝেই জেগে থাকা অবস্থায় মনে পড়ে যায়। তবে এই মাঝে মাঝের মধ্যে সময়ের ফারাক বাড়ছে।

হঠাৎ ঘুম ভেঙ্গে গেল। চোখ মেলতেই বাজ পাখিটাকে দেখতে পেলাম। খানিকটা ওপরে পাথরের ওপর বসে আমার দিকে তাকিয়ে আছে দূরদৃষ্টি নিয়ে। ঝটপট উঠে বসতেই পাখিটা উড়ে গেল। চারপাশে তাকালাম। আলো যেটুকু ছিল এখন তার অল্পই অবশিষ্ট আছে। বোধহয় সন্ধ্যা হতে দেরী নেই। নিচের দিকে তাকাতেই থমকে উঠলাম। কেউ একজন আমার বন্ধ দরজার সামনে দাঁড়িয়ে আছে। দু'জন নয়, একজন। তারপরেই চিনতে পারলাম। জুলি। জুলি আমার কাছে এসেছে কোন প্রয়োজনে? প্রয়োজন থাকলে তো প্রাক্তন নাবিককেই পাঠানো উচিত। আমি জানান দিলাম না। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে জুলি ফিরে গেল।

আমি উঠলাম। এখনও অন্ধকার নামেনি। কিন্তু তার আগে আমার উচিত কিছুটা নিচে চলে যাওয়া। অন্ধকারে এত উঁচু থেকে নামা সহজ কাজ নয়।

সন্ধ্যা নামলে নেমে এলাম বাকীটা। এদিকের রাস্তায় আলো নেই। আকাশে মেঘ থাকায় রাতের আগেই অন্ধকার ঘন হয়ে যায়। দরজা খুলে ভেতরে ঢুকলাম। ওটাকে ভাল করে বন্ধ করে চা বানালাম। তারপর মগটা নিয়ে

ওপাশের জানালার পাশে গিয়ে বসলাম। জানালার নিচে অনেকটা খাদ। খাদের ওপাশে রাস্তা। সেখান দিয়ে ছাড়া আমার এখানে পৌঁছানোর কোন উপায় নেই। যেই আসুক, আমার চোখ এই অন্ধকারেও তাকে বুঝতে পারবে। যে ভদ্রলোক সিমলার হোটেলে খুন হয়েছিলেন তার হত্যাকারী আমি চন্ডীগড়ে থাকাকালীন সময়েও ধরা পড়েনি। আমি জামিন পাওয়া, শেষে মুক্ত হওয়ার পর দু'বছরের ওপর টিঙ্কুর সঙ্গে ছিলাম কিন্তু কেউ আমায় বিরক্ত করেনি। কোন দাবী নিয়ে কেউ সামনে দাঁড়ায়নি। চন্ডীগড় থেকে বেরিয়ে আমি যেখানে যেখানে গিয়েছি কখনও বুঝতে পারিনি কেউ আমাকে অনুসরণ করছে কিনা। না সম্ভব নয়, না সম্ভব নয়। অনেক জায়গায় আমি হটাৎই মাঝরাতে হোটেল থেকে বেরিয়ে ট্রেন ধরেছি। যত ধুরন্ধর অনুসরণকারী হোক, আমি হোটেলের ঘরে শুয়ে আছি। জানার পর মাঝরাতে হোটেলের বাইরে জেগে থাকবে না। তা হলে আমার খোঁজে এই পাহাড়ি শহরে কেউ আসবে কি করে? কিভাবে বলবে আমি এখানে থাকি! হ্যাঁ, যারা আমার কাছে ব্রাউন সুগারের ব্যাগ খুঁজতে এসেছিল তারা এতদিন চুপচাপ থেকে হঠাৎ জেগে উঠবে এটা বিশ্বাস করা যাচ্ছে না। এত বছর ধরে ব্যাগটাকে নিশ্চয়ই আমি সঙ্গে রাখব না।

হঠাৎ দূরে আলো দেখতে পেলাম। জ্বলছে নিভছে এবং জ্বলছে। আলোটা এদিকে এগিয়ে আসছে। আমি সতর্ক হলাম। পরিচয় পেয়ে সন্তুষ্ট না হলে দরজা খুলব না। যদি দরজা ভাঙ্গার চেষ্টা করে তাহলে বাড়ীর পেছনের দরজা যার সিঁড়ি নিচে নেমে গেছে, ব্যবহার করব। ক্রমশ আলোটা আমার বাড়ীর সামনে এল। টর্চের আলো এসে পড়ল বাড়ীর ওপরে। তারপরেই আমি জুলির গলা শুনতে পেলাম, 'মিস্টার শান্ত, মিস্টার শান্ত'।

সবিস্ময়ে দরজা খুললাম। আলোটা জ্বালার কথাও মনে পড়ল না। টর্চের আলো এসে পড়ল মুখে, 'ওঃ ইউ আর হিয়ার! কোথায় গিয়েছিলেন? আমি কয়েকবার আপনাকে খুঁজে গিয়েছি। ভেতরে আসতে পারি?'

'নিশ্চয়ই।" আমি, আলো জ্বালালাম।

জুলি ভেতরে এলেন, 'আমি খুব সমস্যায় পড়েছি।' ওর হাতে একটা ব্যাগ।

'বসুন', আমি দরজা বন্ধ করলাম।

জুলি চেয়ারে বসলেন, 'ও নেই'

'মানে?'

আজ বিকেলে দু'জন লোক আমাদের বাড়ীতে এসেছিল ওর সঙ্গে দেখা করতে। লোক দু'টোর চেহারা দেখে আমার মোটেই ভাল লাগেনি। আমি যাতে শুনতে না পাই, তাই বাড়ীর বাইরে গিয়ে কথা বলল। অনেক্ষণ ধরে ওদের সঙ্গে তর্ক করে আপনার বন্ধু বোধ হয় হাল ছেড়ে দিয়ে ভেতরে ফিরে এসে বলল, একটা জরুরী কাজে বাইরে যেতে হচ্ছে। কাল বিকালের আগে ফিরতে পারবে না। কি জরুরী কাজ জানতে চাইলে বলল, ফিরে এসে বলব। একটা ব্যাগে প্রয়োজনীয় জিনিস আর শার্ট নিয়ে ও চলে গেল স্কুটারে।

এমন অপমানিত আমি জীবনে হইনি। আমাকে কোন কথা বলা প্রয়োজন বলে মনে করল না? শুনতে শুনতে মনে হচ্ছিল, আবার মাথার উপর থেকে বিশাল ওজন নেমে গেল। প্রশান্ত মুখে জিজ্ঞাসা করলাম, 'তারপর'?

'তবে হ্যাঁ, ও যে ইচ্ছের বিরুদ্ধে গেল সেটা বোঝা যাচ্ছিল। এ ব্যাপারে কিছু জানেন?'

'না। আমি কিছুই জানি না।'

'আমার সন্দেহ হচ্ছে আপনার প্রতিবেশী কোন ক্রিমিনালদের সঙ্গে জড়িত ছিলেন।'

'আমার তো মনে হয় না।'

'তাহলে ও যাবে কেন? আর আমাকে ও বলতে পারল না কেন?'

'হ্যাঁ, এইটা অস্বাভাবিক। চা খাবেন?'

'না, আমার ইচ্ছে হচ্ছিল তক্ষণি মায়ের কাছে চলে যেতে।'

'আহা, কাল পর্যন্ত অপেক্ষা করুন। উনি ফিরে এলে।'

'কোথায় অপেক্ষা করব? এই বাড়ীতে? একা?' মাথা নাড়লেন জুলি; ভয়ে আমি মরে যাব। আর কে বলতে পারে আমি একা আছি জেনে লোক দুটো আবার ফিরে আসবে কিনা। উঃ। কি সাংঘাতিক পরিস্থিতি।'

'হ্যাঁ একা থাকা, বিশেষ করে আপনার মত মহিলার পক্ষে খুব মুশকিল।'

'আমি যদি বুড়ি হতাম, অথর্ব হতাম, তাহলে নিশ্চয়ই পারতাম।' 'জুলি মাথা নাড়ল।'

'এখানে তো ভাল হোটেলও নেই।'

‘হোটেলে থাকার চেয়ে আমি এখানে থাকলে ভাল থাকব। জুলি বললেন।’
‘এখানে?’ আমি হতভম্ব।
‘কেন, আপনার আপত্তি আছে? জুলি উঠে দাঁড়ালেন, বেডরুম তো দুটো দেখছি।’
‘না না। আপত্তি কিসের। আপনি স্বচ্ছন্দে থাকুন। তবে।’
‘তবে?’
‘আমি মদ্যপান করি, গন্ধটা সহ্য করতে হবে?’
‘অপমানের জ্বালার থেকে মদের গন্ধ কি বেশী তীব্র? কোন ঘরে যাব?’
‘যে কোন ঘর।’
ব্যাগ নিয়ে জুলি আমার শোওয়ার ঘরে ঢুকে আলো জ্বালালো, দরজা ভেজিয়ে দিলেন না। আমি মদের বোতল আর গ্লাস নিয়ে বসলাম। তাহলে প্রাক্তন নাবিকের সন্ধানে এসেছিল লোক দুটো। কি জন্য এসেছিল তা নিয়ে ভেবে লাভ নেই। আমার কোন সমস্যা নেই জানার পর বেশ হালকা লাগছে। কিন্তু জুলিকে রাতে কি খাওয়ানো যায়? মাছ-ভাত কি খাবে? মিনিট দশেক পরে জুলি বেরিয়ে এলেন। এখন তাঁর পরনে ম্যাক্সি আর শাল। সামনের চেয়ারে বসে বললেন, ‘দিন আমাকে, মদ খেলেই ভীষণ ঘুম পায়। ঘুমালে মাথায় চিন্তা থাকবে না। রাতটা দিব্যি কেটে যাবে।
গ্লাসে বরফ ঢেলে জিজ্ঞাসা করলাম, ‘বলবেন, কতটা জল দেব।’
‘অল্প।’
‘সেই মত গ্লাস এগিয়ে দিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম, রাতে কি খাবেন?’
‘কিছু না।’
এলোমেলো কথা, বেশীরভাগই প্রাক্তন নাবিককে গালাগালি, শেষ করে, তিন গ্লাস পেটে চালান করে উঠে পড়লেন, ঘুম পাচ্ছে। শুতে যাচ্ছি। আপনি নিশ্চয়ই রাতে আমার ঘরে ঢুকবেন না। না, না বলবেন না। আপনি যদি পুরুষ হন, তাহলে আপনার ইচ্ছে করবে। কিন্তু অতিথির ইচ্ছের বিরুদ্ধে কিছু করা অভদ্রতা, তাই না? জুলি চলে গেলেন।
কথাটা আমার মাথায় ঢুকিয়ে গেলেন জুলি। আমি আর মদ খেতে সাহস পাচ্ছিলাম না। কোন অবস্থায় মাতাল হন না। হঠাৎ আমার মনে হল, জুলি আমার ঘরে আসতে পারেন। আমি তো ওর অতিথি নই। তাই অভদ্রতা হবে না। দিনের বেলায় পাহাড়ের ওপরে পালিয়েছিলাম। রাতে কোথায় যাব? তাছাড়া আমার মনে অন্য ভাবনা যদি আসে? আলো নিভিয়ে দ্বিতীয় ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করলাম।
নিজেকে চোর বলে মনে হচ্ছিল। আর পুলিশ যেন আমাকে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

কাল রাতে বেশী মদ্যপান করে ফেলেছিলাম। বেশী মদ খেলে আমার শরীর অচল হয়ে যায়। তখন সবকিছুতেই আলস্য লাগে। এমনকি খাবার খেতেও ইচ্ছে হয় না। আমি সেটাই চেয়েছিলাম। দরজা বন্ধ করে কোনমতে শরীরটাকে বিছানায় নিয়ে যেতে পেরেছিলাম।
যখন ঘুম ভাঙ্গল তখন মাথায় প্রচণ্ড ব্যথা। অর্থাৎ খালি পেটে অতিরিক্ত মদ্যপানের জন্য আমার হ্যাঙওভার হয়েছে। চোখ মেলতেও কষ্ট হচ্ছিল। বাইরে রোদ নেই কিন্তু ঘড়ি বলছে ন’টা বেজে গেছে। জুলির কথা মনে পড়ল। পাশের ঘরে সে আছে। হাজার হোক এই বাড়ীতে ও এখন অতিথি। ভোরবেলায় ওকে চা দেয়া আমার কর্তব্য। অবশ্য এখন ভোর চলে গিয়ে ভরা সকাল। তাড়াতাড়ি বিছানা থেকে উঠতেই দরজায় শব্দ হল।
আমি জানান দিতেই জুলি বলল, ‘ব্রেকফাস্ট রেডি।’
আমি বন্ধ দরজার দিকে তাকালাম। মেয়েরা কি যেখানেই যায় সেখানেই নিজের মত করে সব গুছিয়ে নেয়? এমনভাবে ব্রেকফাস্ট রেডি বলল যে, শুনলে যে কেউ ভাববে ও এই বাড়ীরই কেউ। পরিষ্কার হয়ে এক গ্লাস জলে দুটো ডিসপিরিন ফেলে খেয়ে নিয়ে বাইরে বের হলাম। জুলি চলছিল স্কার্ট আর হাতকাটা শার্ট পরে। মেয়েদের এমনিতেই ঠাণ্ডা কম লাগে। এর বোধহয় আরও কম। বললাম, ‘গুড মর্নিং।’
আমার দিকে তাকিয়ে জুলি খিলখিল করে হেসে উঠলেন।
‘কি ব্যাপার?’ বুঝতে না পেরে জিজ্ঞাসা করলাম।

‘আপনার মুখটা আয়নায় দেখুন, চিনতে পারবেন না।’ জুলি আবার হাসছেন কী বিশাল হয়ে গিয়েছে ফুলে। দরজা বন্ধ করে প্রচুর ড্রিংক করেছেন, না?’
‘ওই আর কি!’ দরজা বন্ধ করে শব্দতিনটে কানে ঢুকল। তার মানে জুলি রাতে আমার ঘরের দরজা পরখ করে গেছে।
চায়ের কাপ নিয়ে বসলাম। সামনের রাস্তা নিঝুম। ছায়া জড়ানো। চায়ে চুমুক দিয়ে বললাম, ‘এবার আপনার থানায় যাওয়া উচিত।’
‘থানায়?’
‘হ্যাঁ। আপনার স্বামীকে দু’জন লোক কিডন্যাপ করে নিয়ে গিয়েছে তা থানাকে জানানো দরকার। ওকে উদ্ধার করতে তো হবে।’ আমি বললাম।
‘আমিও করেছি। কিন্তু ভয় হচ্ছে কেঁচো খুঁড়তে সাপ না বেরিয়ে আসে।’
‘তার মানে?’
‘আপনার প্রতিবেশীর যদি কোন গলতি থাকে?’
‘থাকতে পারে, কিন্তু আমরা সেটা জানি না। যদি খারাপ কিছু হয় তাহলে পুলিশ আপনার বিরুদ্ধেই অভিযোগ করবে, কেন কিডন্যাপ হওয়ার পরও আপনি জানাননি।’
জুলির মুখে চিন্তার ছাপ পড়ল, ‘কিন্তু থানা কোথায় আমি জানি না। তাছাড়া শুনেছি, পুলিশ নাকি খুব খারাপ ব্যবহার করে! আপনি সঙ্গে যাবেন?’
‘যেতে পারি।’ কিছু না ভেবেই বললাম।
সঙ্গে সঙ্গে দুশ্চিন্তা চলে গেল জুলির মুখ থেকে। উৎসাহিত হয়ে বললেন, ‘আসুন, ব্রেকফাস্ট খেয়ে নিই।’
এত অল্প সময়ের মধ্যে তিন তিনটি আইটেম করে ফেলেছেন উনি। খেতে বেশ ভাল লাগছে। বললাম, ‘আপনার রান্নার হাত বেশ ভাল।’
‘তাই!’
‘নিজে হাত পুড়িয়ে রাঁধতাম, এখন মনে হচ্ছে আমার কপাল বেশ ভাল।’
‘দুপুরে কি খাবেন বলুন? আপনার ফ্রিজে দেখলাম বোয়াল মাছ আছে।’
‘আমার এখানে এসে আপনি রাঁধবেন কেন?’
‘কারণ আমার রাঁধতে ভাল লাগে।’ জুলি হাসলেন।
প্রশ্নটা না করে পারলাম না, কিছু মনে করবেন না, আপনাকে গতকাল যে রকম দেখেছি আজ তার ঠিক উল্টোটা, কি করে হল?’
‘বুঝতে পারলাম না।’
‘আপনাকে গতকাল সকালে বেশ বয়সী, গম্ভীর প্রকৃতির বলে মনে হয়েছিল। আজ আপনি খুব সহজ, ঘরোয়া।’ বললাম।
‘তাহলে সঙ্গগুণে এই পরিবর্তন সম্ভব হয়েছে।’ জুলি খাওয়া শেষ করল।
‘কেন? নাবিক কি অন্যরকম মানুষ?’
‘আমি জানি না। তবে ওই বাড়ীতে ঢুকলেই মনে হয় পৃথিবীতে আমার কোন বন্ধু নেই।’
‘আপনাদের তো প্রেম করেই বিয়ে হয়েছিল?’
‘আর প্রেম। তিরিশ বছরের গ্যাপটা এখন সব প্রেম উড়িয়ে দিয়েছে। আমার কথা থাক। আমরা কি এখন থানায় যাব, না লাঞ্চের পরে।’ জুলি উঠে দাঁড়ালেন।
‘এখনই যাওয়া ভাল।’
বেরুবার আগে পাশের ঘরে গিয়ে খুশি হতাম। এর মধ্যেই চমৎকার গুছিয়ে ফেলেছেন জুলি ঘরটাকে। বেশ দেখাচ্ছে।
জিন্স আর জ্যাকেট, হাতে ছাতি নিয়ে জুলি আমার সঙ্গে রওনা হলো। নিজের বাড়ীর সামনে দিয়ে যাওয়ার সময় বললেন, ‘একটা লোক রেখে গেলে হত। যদি ও এর মধ্যে ফিরে আসে। যাক, আসবে বলে মনে হয় না।’
একটা ব্যাপার আমাকে হঠাৎ ভাবালো। কাল থেকে স্বামী নেই, ওকে কিডন্যাপ করা হয়েছে। কিন্তু জুলিকে তো

তেমন চিন্তিত দেখাচ্ছে না। অন্য বউ হলে কান্নাকাটি করত। তৃতীয় পক্ষ বলেই বোধহয় এতটা আবেগ আসে না।
গল্প করতে করতে আমরা থানায় পৌঁছে গেলাম। থানার অফিসার জুলির মুখে ঘটনাটা শুনলেন। তারপর আমাকে দেখিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ইনি আপনার কে হন?'
জুলি বললেন, 'প্রতিবেশী।'
অফিসার আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'একেবারে পাশেই থাকেন?'
'একটু দূরে, তবে মাঝখানে কোন বাড়ী নেই।'
'ওহো, বুঝেতে পেরেছি। আপনি তো একাই থাকেন?'
'হ্যাঁ'।
'এঁর সঙ্গে কতদিনের আলাপ?'
'গতকালই পরিচয় হয়েছে।'
'সে কি? ম্যাডাম কতদিন আপনি স্বামীর সঙ্গে ওই বাড়ীতে বাস করছেন?'
'দু'মাস।'
'এই দু'মাসে আপনার প্রতিবেশীর সঙ্গে আলাপ হয়নি।'
'আমি আগ্রহী ছিলাম না তাই। আমার স্বামী যেতেন ওঁর কাছে।'
'আপনার স্বামীকে কে কিডন্যাপ করতে পারে?'
'আমার কোন ধারণা নেই।'
'আপনার কি ধারণা আছে মিষ্টার?'
'না।' মাথা নাড়লাম আমি।
'কাল থেকে আপনি ওই বাড়ীতে একাই আছেন?'
'হ্যাঁ।'
'আপনার স্বামীর একটা ছবি চাই।'
জুলি ব্যাগ খুলে একটা ছবি বের করে দিলেন, 'আমরা দু'জন এতে আছি।'
অফিসার দেখলেন ছবিটাকে, 'আপনার স্বামী? আশ্চর্য তো! দেখে মনে হচ্ছে আপনি ওঁর মেয়ে। ঠিক আছে, এই ছবি আমি রেখে দিচ্ছি। কেউ যদি আপনার কাছে টাকা-পয়সা চায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের জানাবেন।'
অফিসার এমন ভাব করলেন যে মনে হল কথা শেষ হয়ে গিয়েছে। আমি বললাম, 'কিছু মনে করবেন না, ফর দ্য রেকর্ড, ডায়েরি নাম্বার দেবেন?
'ডায়েরি? কি দরকার?'
'উনি যে আপনার কাছে অভিযোগ জানিয়েছেন তার প্রমাণ।'
'কি দরকার সেটার?'
'এমনি তো কোন দরকার নেই। কিন্তু যদি খারাপ কিছু হয়ে যায়।'
'খারাপ কিছু বলতে?'
'ধরুন, তিনি খুন হলেন। এখন ওঁর স্বামীর সম্পত্তি পেতে এই ডায়েরি ওঁকে সাহায্য করবে। তাই না?' বললাম আমি।
'আই সি। বৃদ্ধ স্বামী খুন হয়ে গেলে যুবতী স্ত্রীর উপকারই হয়। এই পরামর্শ আপনি ওকে দিয়েছেন নিশ্চয়ই!' অফিসার বেঁকিয়ে বেঁকিয়ে বললো।
'আপনি কি বলতে চাইছেন।' আমি রেগে গেলাম।
'কিছু না' একটু অপেক্ষা করতে হবে।'
ঘণ্টাখানেক বাদে ডায়েরির নাম্বার নিয়ে আমরা বাইরে বের হলাম। জুলি খুব বিমর্ষ গলায় বললেন, 'আমার সঙ্গে থানায় আপনাকে কথা শুনতে হল!'
'দূর। আমার গায়ে লাগেনি।'
'লোকটা আপনার আর আমার মধ্যে একটা সম্পর্ক আছে বলে সন্দেহ করছিল।'

‘পুলিশের যা স্বভাব।’ বললাম।
‘যদি শুনতো কাল রাতে আমি আপনার বাড়ীতে ছিলাম তাহলে।’ হাসলেন জুলি, লোকটা তো জানে না আপনি কি ভীতু। সারারাত দরজা বন্ধ করে শুয়েছিলেন।’
‘ঠিক। আমি নিজেকে ভয় করেছিলাম। যদি আপনার অসম্মান করে ফেলি।’
‘তাই?’ জুলি চোখ ঘুরিয়ে আমায় দেখে হাসলেন।
আমরা বাড়ী ফিরছিলাম। জুলি প্রায়ই এত কাছে চলে আসছিলেন যে আমার কাঁধে তার কাঁধ ঘষে যাচ্ছিল। হাঁটতে হাঁটতে বললেন, ‘আজ বোয়াল মাছের এমন একটা প্রিপারেশন আপনাকে খাওয়াবো যা বাজি রেখে বলতে পারি কখনও খাননি।’
‘অপেক্ষায় থাকছি।’ আমি বললাম।
ওদের বাড়ীর সামনে আসতেই দেখতে পেলাম নাবিককে। বারান্দায় বসে আছে। বিধ্বস্ত চেহারায়। আমরা দৌড়ে কাছে গেলাম। জিজ্ঞাসা করলাম ‘কি হয়েছিল?’
‘ওরা ভুল করে আমাকে নিয়ে গিয়েছিল। সারা রাত টর্চার করার পর ভোরে ছেড়ে দিয়েছে। আমি আর পারছি না। তোমরা কোথায় গিয়েছিলে?’
‘থানায়’। জুলি বললেন।
‘আঃ। থানায় কেন গেলে? ওরা বলেছে পুলিশ যেন কিছু না জানে।’
‘ওরা কারা?’ জিজ্ঞাসা করলাম আমি।
‘জানি না’। নাবিক চোখ তুললো, ওরা বোধহয় তোমার বদলে ভুল করে আমাকে তুলে নিয়ে গিয়েছিল। সাবধানে থেকো।’
চলে আসতে আসতে পেছন ফিরে তাকালাম। জুলি একা দাঁড়িয়ে আছে। দরজা খোলা। জুলি হাসলেন। হঠাৎ আমার মনে হল কথাটা নাবিক বানিয়ে বলেনি তো? আমাকে ভয় পাইয়ে দেয়ার জন্য। বার্ধক্য তো চিরকাল যৌবনকে ভয় করে। জুলির হাসি তো সে কথাই বলছে। বাড়ী ফিরেও আমি আশা করছি, জুলি আসবে এবং ফ্রিজে ঠাণ্ডা হয়ে পড়ে থাকা মাছটাকে দারুণভাবে রাঁধবে। আশা করতে আমার ভাল লাগছে। কি করব!